প্রতিধ্বনি **the Echo**

A journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

শেষের কবিতা : পুনঃপাঠের প্রস্তাবনা

মধুমিতা সেনগুপ্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Abstract

Most of the people say, Tagore's 'Shesher Kabita' is the story of Amit Roy. The question arise, who is this Amit Roy? Is Rabindranath Tagore's Shesher Kabita' realy a just story of Amit Roy? We know, this Amit Roy and his revolutionary theory of devine love is note of admiration till now. There has been a lot of debate regarding its acceptability of new theory of love. As a male character, so far priority was given to Amit Roy, whether the similar importance was given to female characters? The present paper attempts to explore the answer of these questions and review the novel with analyzing various characters.

'শেষের কবিতা' উপন্যাস লিখতে গিয়ে 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সফল সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁরাই তো এই ধ্বনি শুনতে পান। তবুও আমরা জানি, 'চোখের বালি, 'গোরা', 'যোগাযোগ' বা 'চতুরঙ্গ'র মত উপন্যাসের স্রষ্টাকেও তাঁর সমসাময়িক বা ঈষৎ পরবর্তীকালে সমালোচনার তির্যক বাক্য শুনতে হয়েছিল। একথাও আমাদের অজানা নয় যে, মুলতঃ কল্লোল-কালিকলমীয় লেখকেরাই এই অভিযোগকে আন্দোলিত করেছিলেন। ফলে শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ। স্থবির সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, কোন বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, বিদ্রোহটা ছিল রবীন্দ্রনাথেরই বিরুদ্ধে এককভাবে।

আধুনিক সাহিত্যের ফ্যাশন দৌরাত্মে রবীন্দ্রসাহিত্য যে ক্রমে একঘরে হতে চলেছে – তা অনেক আগেই অনুভব করতে পেরেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাই কোন সংঘর্ষে না গিয়ে গভীর অভিজ্ঞতায় কবিগুরু উচ্চারণ করেন-

"সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়

নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে হবে।
হোক লয় সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নবলেখা আসি
দর্পভরে তার ভস্মস্তূপরাশি বিদীর্ণ করিয়া
দূরান্তরে উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা
করি জয়, নবীনের রথ যাত্রা লাগি।"[১]

এই নবীনের রথযাত্রার গান করতেই কবির শেষ প্রচেষ্টা 'শেষের কবিতা'। রচনার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি খণ্ডোপন্যাস বাদ দিলে 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)-ই শেষ উপন্যাস। নামটিও তাই এমন ইঙ্গিতপূর্ণ।

উপন্যাসে কবিত্বের ছড়াছড়ি নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। আমার মনে হয় নবলেখার দর্পভরে গৎবাঁধা লেখালেখি থেকে যে লেখকেরা বেরিয়ে আসতে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, কাব্যময় এই উপন্যাসটি তাদেরই বিরুদ্ধে কবির এক নীরব প্রতিবাদ। কবি রবীন্দ্রনাথ কবিতার উপরেই দিয়েছেন তার শেষ কথা বলার গুরুদায়িত্ব। হয়তো তাতে উপন্যাসের সংজ্ঞার যে নির্দিষ্ট মাপকাঠি তা কিছুটা বেঁকেচুরে গেছে সত্য। কিন্তু এটাও তো অস্বীকারের উপায় নেই যে, 'ভাঙন পেছনে থাক, নির্মাণ সম্মুখে; পুরনোকে গুড়িয়ে দিয়েই বিনির্মিত হয় নতুন সত্য'।

আকারের দিক দিয়ে খুব ছোট 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। মাত্র সতেরোটি পরিচ্ছেদে তার পরিসমাপ্তি। এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, জানিনা পাঠকেরা আমার সহমত হবেন কিনা। টাইপ এর দিক থেকে 'শেষের কবিতা' উপন্যাস কবিতারই বৈশিষ্ট্য বহন করছে। কবিতা যেমন কবির কম শব্দ খরচে ব্যঞ্জনাময় উপলব্ধি প্রদান। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসও আসলে তাই নয় কি? বক্তব্য পেশ কিংবা চরিত্রের দ্বন্দ্ব সব ব্যাপারেই ঔপন্যাসিক বিশদ বিশ্লেষণের পথ এড়িয়ে গেছেন। নিপুণ তুলির টানে বুঝিয়ে দিয়েছেন চরিত্রের গতিপ্রকৃতি, আর বক্তব্যের শেষ ভার তুলে দিয়েছেন, ছন্দোবদ্ধ ভাষাভঙ্গির উপর।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে, অমিতের গল্প দিয়ে। চমৎকৃত হই যখন নিজের সৃষ্ট চরিত্র এই অমিতের মুখ দিয়ে লেখক নিজেই সমাপ্তি ঘোষণা করেন নিজের কবি জীবনের। এদিক থেকে উপন্যাসটিতে নতুনত্ব আছে। উপন্যাস পড়তে শুরু করে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের এমন মরণ-মহোৎসবে আমরা রীতিমত হকচকিয়ে যাই। কিন্তু যে, 'শেষের কবিতা' তার মাত্র সতেরোটি পরিচ্ছেদ নিয়ে আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, তার কারণ লুকিয়ে আছে অন্যত্র। সমালোচনাগ্রন্থের পাতা খুললে চোখে পড়ে, 'শেষের কবিতা' যে আলাদা করে খুব বেশি আলোচিত হয়েছে তা-নয়। তবুও 'শেষের কবিতা' আলোচিত হয়। হয় কলেজ পড়ুয়াদের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে, কলেজ ক্যান্টিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছতলায়। কখনো বা বুদ্ধিজীবিদের সান্ধ্য আড্ডাতেও তা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? ‘শেষের কবিতা’ আস্ত একটা প্রেমের উপন্যাস বলেই কি? বাংলা সাহিত্যে প্রেমের উপন্যাসের তো ছড়াছড়ি। তবে ‘শেষের কবিতা’-ই কেন এত জনপ্রিয়, পাঠকের বিশেষত তরুণ পাঠকের কাছে। আসলে উপন্যাসটিতে লেখক প্রেমবিষয়ক এমন অনেকেরা নতুন এক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন-যা এতদিনের প্রচলিত ধ্যানধারণা বিশ্বাস থেকে একঝটকায় সরিয়ে এনে এক হঠাৎ আলোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। প্রথমে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তারপর উঠে হাজারো তর্ক-বিতর্ক। তত্ত্বের বাস্তবতা-অবাস্তবতা নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব। সরাসরি সেই দ্বন্দ্বের খুব কাছাকাছি না গিয়ে বরং সেই চরিত্রগুলোর কাছাকাছি যাই, যে চরিত্রগুলোর সুখদুঃখ, ব্যাথা-বেদনার আঙ্গিকে নরনারীর প্রেমের সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের উৎসারণ।

‘শেষের কবিতা’ মূলতঃ চারটি চরিত্র অমিত-লাবণ্য-কেটি-শোভানলাল এর প্রেমের গল্প। কেউ কেউ বলেছেন- ‘শেষের কবিতা’ অমিত লাবণ্যের প্রেমের গল্প। কেউ আবার বলেছেন- ‘শেষের কবিতা’ অমিত রায়ের গল্প। সবগুলো মতামতকে এক জায়গায় জড়ো করে উপন্যাসটি যদি একবার নতুন করে পড়ি, তবে মনে হয় যেন চরিত্র যেন চরিত্র হিসেবে অমিত রায় একটু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে তার অভিনবত্বে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মহেন্দ্র-বিহারী-শচীশ-শ্রীবিলাস-গোরা-বিনয়-কিংবা মধুসূদনের পাশাপাশি অমিত রায় রবীন্দ্রনাথের এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি।

কিন্তু একটা ব্যাপার অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যায় যে, ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে অমিত নামের একটিমাত্র পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সমস্ত নারীচরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। কেউ তাকে মাতৃস্নেহে ধন্য করেছে, কেউ প্রেমস্পদের স্থান দিয়েছে, কেউ স্বামীরূপে বরণ করেছে, কেউ বা তার বিয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছে, কেউ আঘাত করেছে, তার স্বপ্নকে ‘আইডিয়ার-ফানুস’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তবুও প্রতিটি নারিচরিত্রের একমাত্র লক্ষবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিত রায়। কিন্তু কোথাও যেন আমার মনে হয়, উপন্যাসে প্রতিটি নারীচরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে লেখকের অতিযত্নে লালিত অমিত চরিত্র। জানিনা, এ ভাবনায় আজকের পাঠকের বিশ্বাসী হবেন কি না?

অমিত ভাবে, সে নিজে যেমন স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তার প্রণয়ের পাত্রীটিও তেমন অদ্বিতীয়া হয়া চাই; যাতে ড্রয়িং রুমে আর পাঁচজনের মাঝখানে তার অস্তিত্ব হারিয়ে না যায়। অমিতের কল্পনায় নারীর অবয়ব কল্পিত হয় স্বর্গদেবের আকল্পে। ‘মন্দিরপর্বতের নাড়া খাওয়া ফেনিয়ে ওঠা সমুদ্র থেকে’ যে দেবীর আবির্ভাব।

আর বাস্তব সমাজের নারী? যুগযুগ ধরে যে নারীরা পুরুষতন্ত্রের বানিয়ে তোলা গোলকধাঁধায় পথভ্রান্ত হচ্ছে সেই নারীদের কোন চোখে দেখছে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র অমিত রায়? আমাদের ভুলে গেলে চলে না, মেয়েদের উপরে পুরুষদের আধিপত্য নিয়ে কোন এক সমাজহিতৈষীর সঙ্গে কথোপকথনে অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস্ করে বলে---

''পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।'' সে আরো বলে- ''যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে অর্থাৎ মায়া দিয়ে, শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমের ভরা, প্রকৃতি শয়তানী তার জোগান দেয়।'' খুব স্বাভাবিকভাবেই অমিত চরিত্রের কাছে তা আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না।

শানিয়ে বলা কথার তুরূপ সাজিয়ে অমিত সভায় বড় বড় বক্তৃতা দেয়, চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্যে মেয়েদেরকে মুগ্ধ করে। কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য যে কতটা অন্তঃসারশূণ্য মেয়েদের তা বুঝতে বাকী থাকে না। বোন সিসির কাছ থেকেই আসে প্রত্যাঘাত ''কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোন পদার্থই নেই; যখন যেটা রেশ ভালো শোনায় সেইটিই তুমি বলে বস।'' উত্তরে অমিত বলে-''আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।'' তাই সমালোচকদের বক্তব্য অনুযায়ী অমিত চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য আসলে কোথায় সে প্রশ্নের মীমাংসা পাই না।

কলকাতা থেকে ছুটি কাটাতে এসে শিলং পাহাড়ে কাকতালীয়ভাবে লাবণ্যের মুখোমুখি হয় অমিত। শিলং পাহাড়ে প্রথম পরিচয়ের পর লাবণ্যের সঙ্গে অমিতের ধীরে ধীরে আলাপ এবং আলাপ থেকে প্রেম। মূলতঃ সেই প্রেমের বিশেষত্ব এবং কাব্যনিষ্ঠ মোহমায়াই আচ্ছাদিত করে রাখে সমগ্র উপন্যাসকে। আর সেই আচ্ছাদনের তলায় হারিয়ে যায়, মানবীসত্তার যথার্থ জীবনোপব্ধির গুরুত্ব এবং তাকে বিশ্লেষণ করে দেখার আশু প্রয়োজনীয়তাও।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকা বলতে সাধারণভাবেই ব্যক্তিত্বময়ী নারীর ছবি ভেসে ওঠে মনে। বিনোদিনী, কুমুদিনী, সুচরিতা, দামিনী, কিংবা এলা সবার মুখেই আসলে সমস্বরে উচ্চারিত হয়েছে

''নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জানি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে?
শুধু শুণ্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ?'' (সবলা)

লাবণ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সমালোচকেরা আবার প্রশ্ন তুলেন ‘‘একটি যুক্তিবাদী ও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ে অমিতের উচ্ছসিত প্রেমে যেভাবে বিগলিত হয় এবং শেষে সেই প্রেম প্রত্যাখানের মধ্য দিয়ে যে আপাত অস্বাভাবিক পরিণতি বেছে নেয়, সেই কারণেই তার চরিত্র কিছুটা দুর্বোধ্য ও জটিল হয়ে পড়েছে।’’[২] আর সেজন্যেই লাবণ্য চরিত্রের গুরুত্ব অনেকখানি। আদৌ তার পরিণতি অস্বাভাবিক কিনা, স্বেচ্ছায় এই পরিণতি বেছে নেওয়ার পেছনে তার চারিত্রিক অসংগতি ধরা পড়ে, না কি নারীচেতনার অন্য একটি গতিপথের সন্ধান দেয়-আজকের যুগে তা একবার নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বৈকি।

সম্পর্ক যত এগিয়েছে প্রেম তত গভীর হয়েছে। ক্রমে লক্ষ্য করি অমিত এবং লাবণ্য পরস্পরের কাছে ‘মিতা’ ও ‘বন্যা’ এই দুটি নামে বাঁধা পড়েছে। অমিতের কন্ঠেই শুনি – ‘‘হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা/আপন ধন্যা।’’ যথারীতি লাবণ্য মুগ্ধ হয়। হবেই বা না কে, আসলে নারী তো তাই চায়, পুরুষ তার সমস্ত পৌরুষ নিয়ে বলিষ্ঠ দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করুক ভালোবাসার কথা। এর চেয়ে বেশি চাওয়া নারীর আর কী হতে পারে। সেই অঞ্জলীভরা মুগ্ধতার জন্যে নারী সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারে। আর সেজন্যেই হয়তো শোভানলালের আবির্ভাব লাবণ্যের জীবনে তেমন ছাপ ফেলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তার কারণ হিসেবে বলেন – ‘‘একদিন শোভনলাল বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য – নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসেছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না।’’

ডাক দিয়েছিল অমিত। ভালোবাসার উত্তাপে ধন্য করেছিল লাবণ্যের নারীজীবন। ‘ঘরে বাইরে’র বিমলাকেও সন্দীপ এমনকি করে ডাক দিয়েছিল। যে ডাকে নিখিলেশের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল বিমলা। অবশেষে ভুল বুঝে শুভবোধ নিয়ে পুনরায় ফিরে গেছে নিখিলেশের কাছে। কিন্তু কেন জানি মনে হয়, পুরুষের প্রবৃত্তির কাছে হার মানেছে বিমলার নারীত্ব। সন্দীপ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে বিমলাকে। আর নিখিলেশ; বিমলা ভুল করেছে জেনেও তাকে বাধা দেয় না। বরং গৃহসীমায় স্বেচ্ছাবন্দী স্ত্রীকে বলে – ‘‘আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই, ওইখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকি আছে।’’ কিন্তু বিমলা একান্ত নিজস্ব চাওয়া পাওয়া যেন অস্পষ্টই থেকে যায় সমগ্র উপন্যাসে।

লাবণ্য এর থেকে ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী কিংবা দামিনীও তাই। তারা কেউই বিনাপ্রশ্নে জীবনে ত্যাগ স্বীকার করতে শেখেনি। ‘নারী ত্যাগের প্রতীক’ তথাকথিত এই প্রবাদকে তারা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে

যুক্তির মাধ্যমে জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অমিত যখন লাবণ্যকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে যোগমায়ার কাছে এসে মত চায় এবং পেয়েও যায়, তখন থেকেই লাবণ্যর মনে বাঁধে দ্বন্দ্ব। বাস্তবঘেঁষা চরিত্র লাবণ্য বুঝতে পারে, অমিতের স্বপ্ন-কল্পনা, তার বড়ো বড়ো আদর্শ সবকিছুই আসলে ফাঁকি। নিজের কল্পিত স্বপ্নরাজ্যে নারীকে সে করে রেখেছে অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা। তার প্রেম প্লেটোনিক, বাস্তবের সঙ্গে যার কোন সংযোগ নেই। প্রেয়সী এবং শ্রেয়সীকে সে এক জায়গায় বাঁধতে চেয়েছে কিন্তু লাবণ্য অমিতকে ধরিয়ে দেয় তার ভুল – ''তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফেরো।'' তাই অমিতের প্রতি অদম্য ভালোবাসা থাকা সত্বেও সেই স্বপ্নরাজ্য থেকে লাবণ্য সরে এসেছে নিঃসন্দে। যে লাবণ্য বলতে পারে – ''আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করিনে'' – তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক।

চেতনাসম্পন্ন নারী কখনোই পুরুষের ছকবাঁধা এই স্বপ্নের খাঁচায় ধরা দিতে চায় না বরং স্বপ্নকে গুড়িয়ে দেয়। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কথা। যেখানে শশী কল্পনা করে ''কেয়ারি করা ফুলের বাগানে ব্লাউজ পরিহিত রমণী' কে। তার স্বপ্নকে গোলাপের চারার মতো পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে যায় এক গ্রাম্য গৃহবধু কুসুম। বলিষ্ঠ কণ্ঠের জোরে সে শশীর সাজানো বাগান গুড়িয়ে দিতে চায়। লাবণ্যর প্রতিবাদ কুসুমের মত ততটা সোচ্চার নয়, গভীর উপলব্ধির আলোকে সমস্ত বন্ধন থেকে অমিতকে মুক্তি দিতে সে নিঃশব্দ অভিযান চালিয়ে যায়। ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে বলে-

"তোমারে দিই-
নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাই প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্য রাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

অমিতের প্রতি তার ভালোবাসা যে কতখানি গভীর ছিল – সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তার পরিচয় পাই আমরা। অথচ অমিত কিন্তু লাবণ্যর মনের খবর রাখে না। একদিন বর্ষার দিনে অপেক্ষারত লাবণ্যর কাছে ইচ্ছে থাকলেও একটি তুচ্ছ 'বর্ষাতি'র অভাবে সে যোগমায়ার বাড়ির দিকে পা বাড়ায় না। খোঁজ রাখে না সে যোগমায়ারও। যে যোগমায়া লাবণ্যের দুঃখমোচনে মাতৃহৃদয়ের অসীম মমত্ব নিয়ে এগিয়ে এসে চার হাতের মিলন ঘটিয়েছেন অমিতের বাসায়, সেই যোগমায়াকে যখন নিজের বোন এবং পুরনো প্রেমিকা এসে অপমান করে, তখন অমিতের

সরব প্রতিবাদ করতে দেখিনা, ফলে পাঠকের অতিপ্রিয় অমিত চরিত্রটিকে আর একটু নতুনভাবে ভেবে দেখার অবকাশ থেকেই যায়।

অমিত চরিত্র বিশ্লেষণে শ্রী অমিয় চক্রবর্তী অবশ্য অমিতের পক্ষে বলেন – ''যাঁরা আর্টিস্ট হয়েও আর্টিস্টের চেয়ে বড়ো অর্থাৎ যাঁরা মহান চরিত্রবান পুরুষ তাঁরা আর্টকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেও জীবনের বিবিধ দায়িত্বের মধ্যেই আর্টকে সংগত করেছেন। যেকোন আর্টিস্টের পক্ষে এই দুই দায়িত্ব – সংসারের প্রতি দায়িত্ব এবং আর্টের প্রতি দায়িত্ব – এক সঙ্গে পূর্ণ করে চলা কঠিন। অমিত রায়ের পক্ষে তা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। প্রথম থেকেই সেকথা আমরা বুঝতে পারি।''[৩] লাবণ্যও গভীরভাবে একথা উপলব্ধি করেছিল বলেই বিয়েতে অসম্মতি জানিয়েচে। তার এ অভিব্যক্তি আরও দৃঢ় হয়েছে অমিতের পূর্বতন প্রেমিক কেটি মিত্রের আগমনে।

ড০ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, কেটির প্রতি 'অমিতের সঙ্গত আকর্ষণের ব্যাখ্যা কোথায়?''[৪] তাঁর মতে অমিত কেটিকে ভালোবাসেনি, অভিনয় করেছে মাত্র। কথাটি অনেকাংশে সত্যি নয়। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ লাবণ্য উপলব্ধি করে নারীমনের অর্ন্তনিহিত বেদনার কথা, যখন অভিমানক্ষুব্ধ কেটি অমিতকে তার আংটি প্রত্যার্পণ করে বললো – ''বাজিতে যদিই হারলুম, তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক অমিত।'' প্রেমহীন আংটির কথা কেতকী ভাবতে পারে না। তাই লেখক জানান – ''আংটি খুলে টেবিলটির উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল করা মুখের উপর দিয়ে দর্‌দর্‌ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।''

এই প্রথম একটি যন্ত্রণাকাতর মেয়েকে আবিষ্কার করি আমরা। মেকি প্রসাধন, কৃত্রিম জীবনযাত্রা সবকিছুকে তুচ্ছ করে যার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে এক চিরন্তন প্রেমিক, যে অমিতকে যথার্থ ভালোবাসতে পেরেছিল। বুদ্ধদেব বসু এই দৃশ্যটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন – ''তাঁর মুখের কথায় যে বেদনার সুর শুনতে পাই, সেই সুর অমিত-লাবণ্যর কথাবার্তার মধ্যে একবারও লাগেনি। 'শেষের কবিতা'য় প্রেমের বিষয়ে ব্যাখ্যা আছে অনেক। কিন্তু ঐ একটি জায়গাতেই আমরা অনুভব করি যে কেউ কাউকে ভালোবাসলো – বা বেসেছিল।''[৫] সমালোচকের এই মন্তব্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। শুধুমাত্র বিস্মিত হই এই ভেবে যে, এরকম একটি নারীচরিত্র বাংলা সাহিত্যে প্রায় অবহেলিতই থেকে গেল। এর জন্যে হয়তো দায়ী অনেকটাই স্বয়ং লেখক। কারণ অমিত-লাবণ্য আখ্যানের প্রাবল্যে উপন্যাস কেটি মিত্তিরের জন্যে জায়গা রেখেছিলেন সীমিত।

লাবণ্য তো ঠিক করেই ছিল, যে পুরুষ শুধুমাত্র নিজের মনোরঞ্জন করে বেড়ায়, অন্যের মনের খবর রাখে না এবং কল্পনার নারীকে ঘরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে চায় – তাকে নিয়ে ঘর করা চলে না। এছাড়া কেতকীর মনের ভালোবাসার সন্ধান পেয়ে সে একটুও দেরী না করে অমিতকে অনুরোধ করে – ''অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেরিয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার, ওকে আমোদ দিতে পারবে।'' নারীমনের এই ঔদার্য আমাদের বিস্মিত করে। লাবণ্য জানত, বাস্তব লাবণ্য অমিতের কামনা নয়, তাই কল্পনার লাবণ্য বিবাহের প্রাত্যাহিক তুচ্ছতায় মলিন হয়ে যাক্ অমিতের কাছে তা সে কোনমতেই চায়নি। কবিতায় সে বলে –

"মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে।"

লাবন্যর এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি হতে পারত। কারণ বাংলা সাহিত্যে বিয়োগান্ত গল্পের জনপ্রিয়তার অভাব ছিল না। কিন্তু রবিন্দ্রনাথ সেই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাননি। আর তাই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ 'শেষের কবিতা'য় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে অপার বিস্ময়। শুনতে পাই, শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে অমিতের বিয়ে, এবং অমিতকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের মধ্যে কেটিকে বিয়ে করার অনুরোধের কোন ইঙ্গিত আমরা পাইনা। বুঝতে পারি, এটা অমিতের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্র সাহিত্যে খুব কম নারীই বিনা প্রশ্নে পুরুষের এধরণের অন্যায় মাথা পেতে নিয়েছে।

লাবণ্যও প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু তার স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তাইতো সে বলে –

"মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই -
শূণ্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠায় আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষায় থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।"

উপন্যাসের শেষে শোভনলালের সঙ্গে যে লাবণ্যর বিয়ে ঠিক হয়েছে, একথারও ইঙ্গিত পাই আমরা। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্ত লাবণ্য চরিত্রটিকে একটু জটিলতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা জানি, শোভনলালের প্রেমকে প্রত্যাখান করলেও তার জন্যে লাবণ্যের মনে বেদনা সঞ্চিত ছিল। অমিতের জীবন থেকে সরে এসে সে সেই বেদনার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়।

তাই বলে অমিতের প্রতি তার ভালোবাসায় কোন খাদ ছিল কিনা – এ সন্দেহ বৃথা। অমিতের স্বপ্ন কল্পনার সোনালী খাঁচা এবং দাম্পত্যজীবনের

গণ্ডীতে নিজের প্রেমকে আবদ্ধ করতে চায়নি বলেই শোভনলালকে সে নিজের জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করে। তাই শেষ চিঠিতে অমিতকে বলে –

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

আর অমিতের উদ্দেশ্যে সে রেখেছে -

"সব চেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে।
... ...
তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।"

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এজায়গাতেই থেমে থাকেননি। লাবণ্য কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়ে কেটি মিত্তিরকে বিয়ে করার পেছনে অমিতের যে যুক্তি শেষে স্থাপন করেছেন, তার অভিনবত্বেরই 'শেষের কবিতা' পৌঁছে যায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে। যতিশংকরের সঙ্গে কথোপকথনে অমিত বলে – ''যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সবকিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই। ... একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।''

বলা যায়, প্রেম সম্পর্কিত যত যাবতীয় সংস্কারে আমাদের মন এতদিন বদ্ধ ছিল। বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের সন্ধানে তার মুক্তি ঘটল। কিন্তু আদৌ কি বাস্তব তা সম্ভব ? ছোট্ট বাসায় ডানা গুটিয়ে বসা পাখি একই সঙ্গে আকাশ এবং বাসায় তার ডানা মেলে উড়তে পারে বলে আমাদের সন্দেহ হয়। এ শুধু অমিতের পক্ষেই সম্ভব। তাই যে অমিত বলতে পারে, - ''কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'' সে-ই-আবার বলে-

"আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা।
সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই
ভুল বুঝবে, আমাকে গাল দিয়ে বসবে।"

অমিত এবং লাবণ্য চরিত্রের বৈপরীত্য এখানেই। অমিতকে অস্বীকার করে শোভনলালকে গ্রহণ করতে গিয়ে লাবণ্যের কোন সঙ্গ – আসঙ্গ তত্বের অবতাড়নার দরকার হয় না। দরকার হয় না, দুটি পুরুষের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখার প্রয়োজনও। বরং অকুণ্ঠ সততায় সে বলতে পারে – ''পরিবর্তনের স্রোতে আমি চাই ভেসে/কালের যাত্রায়/হে বন্ধু বিদায়''।

অমিত সম্পর্কে সমালোচক বাসন্তী মুখোপাধ্যায় বলেন – ''অমিত রায় বাস্তব জগতে দূর্লভ; সে

মনোবিজ্ঞানীর গবেষণার বস্তু, কিন্তু কবির সচেতন সৃষ্টি।''[৬] আমাদেরও মনে হয় যতটা সচেতনতা নিয়ে লেখক অমিত চরিত্রকে এঁকেছেন, ততটা অন্য চরিত্র নয়। অথচ অমিতের বিশেষত্ব – তার ব্যতিক্রমী স্টাইল এবং শেষোক্ত তত্ত্বকথার অবতাড়নায়। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবলে বলতে পারি, লাবণ্য যদি অমিতকে বাস্তবজীবনে অস্বীকার না করত, তবে অমিতকেও সেই অসাধারণ তত্ত্বকথা আওড়াতে হত না। এককথায় বলতে পারি, অমিতকে অস্বীকার করার উপলব্ধিটা যদি লাবণ্যর না আসত, তবে অমিত কথিত সেই বিস্ফোরক তত্ত্বকথাটিও উহ্য থেকে যেত। আর অমিত ? সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের এক প্রত্যাখান নায়ক হয়েই থেকে যেত চিরকাল।

''শেষে নাহি যে, শেষ কথা কে বলিবে''-তাই আমারও ভার নেই শেষ কথা বলার। আমার শুধুমাত্র আপাত-কথা বলার অধিকারী। সেই অধিকার নিয়েই বলতে পারি, যে অমিত বলতে পারে – ''আমার রোমান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্স, আমার মর্তেও ঘটাব রোমান্স'' – সেই অমিত অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের আর পাঁচটা নায়ক থেকে আলাদা। তাকে বুঝতে গেলে সহমর্মী মন নিয়ে তার খুব কাছাকাছি যেতে হয়, কারণ বাস্তব জগতে সে বেমানান। অথচ এই অমিত চরিত্র রূপায়ণে লেখকের যত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যেত, যদি না তিনি নারী চরিত্রগুলোকে এত কার্যকরী করে তুলতেন। অমিত নিজেই বলেছে – ''জয় হোক আমার লাবণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।'' অমিত রায় ধন্য হয়েছিল অবশ্যই। কিন্তু শুধুমাত্র কেতকী লাবণ্য নয়, প্রতিটি নারী চরিত্রের অকুণ্ঠ অবদানে। অমিতের সফলতায় লিলি গাঙ্গুলি, মিমি বোস, যোগমায়া কারোর কথা আমাদের ভুলে গেলে চলে না। কেননা তাদের সবার কেন্দ্রবিন্দু ছিল অমিত। অমিতের কল্যাণে সবাই কোন না কোন লড়াইয়ে ব্যাপ্ত ছিল। বিনিময়ে তারা কিন্তু একমুঠো আলোও পেল না। কারণ অমিত এবং অমিত কথিত তত্ত্ব নিয়ে 'শেষের কবিতা' এমনভাবে আমাদের কাছে মাথা তুলে দাঁড়ায় যে, আমরা প্রায় ভুলেই যাই নেপথ্যচারিণী নারী সত্তার কথা। যে নারী অকপটে দাবী করে –

"আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুরে বেঁধেছি জ্যোৎস্নাবীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।"

<u>সুত্রনির্দেশ</u>

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/হীরেন চট্টোপাধ্যায় : শেষের কবিতা : শিল্পিত জীবন, পৃ; ১৮ ।

২। হীরেন চট্টোপাধ্যায় : শেষের কবিতা : শেষের কবিতা : শিল্পিত জীবন, পৃ; ৫৯ ।
৩। অমিয় চক্রবর্তী/ হীরেন চট্টোপাধ্যায় : শেষের কবিতা : শিল্পিত জীবন, পৃ; ৬৩ ।
৪। শ্রীকুমার বন্ধ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-১৩৪৫, পৃ; ১৬৬ ।
৫। বুদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য ।
৬। বাসন্তী মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে চরিত্র ব্যাখ্যান, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পৃ;১৬৮ ।